স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনে করণীয়

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩ জুলাই, ০৮)

গত ২০ জুন, ২০০৮ নির্বাচন কমিশন মেয়াদোত্তীর্ণ ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে। আমরা আশা করি যে, এ সকল নির্বাচন সুষ্ঠু ও প্রশ্নাতীতভাবে নিরপেক্ষ হবে এবং এর মাধ্যমে প্রশাসনের সকল স্তর বা একাংশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। একইসাথে সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত হবে এবং *কুদরত-ই-এলাহি পনির বনাম বাংলাদেশ* [44DLR(AD)(১৯৯২)] মামলার রায়ও প্রতিপালিত হবে।

একটি সত্যিকারের 'পূর্ণাঙ্গ' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে হলে সর্বস্তরে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক এবং তাদের কাছে দায়বদ্ধ একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ – জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা – আমাদের সংসদকেন্দ্রিক গণতন্ত্রের খুঁটি বা মেরুদণ্ডস্বরূপ। এছাড়া একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্যও অপরিহার্য। কারণ স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে, স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে ও জনগণের সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অনেক সমস্যার সমাধান স্থানীয়ভাবে করতে পারেন। আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠবে।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের জন্য মজবুত আইনি কাঠামো যেমন অপরিহার্য, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সজ্জনদের এ সকল প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে থাকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আজ দুর্নীতিবাজ-দুর্বৃত্তদের আখড়ায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ইতোমধ্যে পাঁচজন নগরপতি কারাগারে রয়েছেন এবং বাকী অন্যজনের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে অনেক কমিশনারই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই নির্বাচন শুধুমাত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলেই হবে না, এতে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, কালোবাজারি, কালোটাকার মালিক, দখলদার, যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা বা তাদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। একইসাথে সৎ, যোগ্য, ত্যাগী ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিগণ যেন নির্বাচিত হতে পারেন সেই পরিবেশ তৈরি করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সজ্জনদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখতে হলে যথোপযুক্ত আইনি কাঠামোর মাধ্যমে প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠিকে কঠোর করা দরকার। একইসাথে দরকার প্রার্থীদের তাদের নিজেদের এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলদের তথ্য প্রদান এবং এ সকল তথ্য ভোটারদের মধ্যে বিতরণ, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। আরো দরকার দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের প্রথম রায় ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা। নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস না করা গেলে সৎ প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী করা সম্ভব নয়। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে আগ্রহী করার জন্য আরো প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক দলের এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ ও সদাচরণ। এছাড়াও প্রয়োজন হবে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানের যথার্থ, পরিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ। নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠির কঠোরতা

সম্প্রতি সরকার *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮* ও *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৮* জারি করেছে। এগুলোতে নির্বাচনে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠি আরো কঠোর করা হয়েছে। একইসাথে তাদের অপসারণের মানদণ্ডও নিরুপণ করা হয়েছে।

অধ্যাদেশদ্বয়ের বিধানানুযায়ী কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হওয়ার বা মেয়র বা কাউন্সিলর পদে থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি: ক. বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান; খ. কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ বলে ঘোষিত হন; গ. দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং সে দায় থেকে অব্যাহতি লাভ না করেন; ঘ. কোন ফৌজদারি বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দু'বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকেন; ঙ. প্রজাতন্ত্রের বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন; চ. কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এমন কোন বেসরকারি সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহি পদ থেকে পদত্যাগ বা অবসরগ্রহণ বা পদচ্যুতির পর এক বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকেন; ছ. কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতিত, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকায়

সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহিত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তার নিজ নামে বা তার ট্রাস্টি হিসেবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তার সুবিধার্থে বা তার উপলক্ষে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসেবে তার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেন; জ. তার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কার্য সম্পাদনে বা মালামাল সরবরাহের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অংশিদার হন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কোন বিষয়ে তার কোন আর্থিক স্বার্থ থাকে; ঝ. নিজস্ব বসবাসের নিমিত্তে গৃহনির্মাণ ও ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতিত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখের আগের এক বছরের মধ্যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহিত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন; ঞ. এমন কোন কোম্পানি বা ফার্মের অংশিদার হন, যা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহিত কোন ঋণ বা ঋণের কিস্তি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখের আগের এক বছরের মধ্যে পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন; ট. সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করেন এবং তা অনাদায়ী থাকে; ঠ. সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে পরিশোধ না করেন; ড. অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন; ঢ. কোন সরকারি বা আধা-সরকারি দফতর, কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকরি থেকে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চাকরিচ্যুত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার এমন চাকরিচ্যুত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পাঁচ বছর কাল অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে; ণ. সরকার কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থার সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন পদে নিয়োজিত থাকেন; ত. সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার তহবিল তসরুফের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন; থ. বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধির ধারা ১৮৯ ও ১৯২-এর অধীন (সরকারি কর্মচারিকে ক্ষতিসাধনের হুমকি এবং নিরাপত্তা বিধানার্থে সরকারি কর্মচারির কাছে আবেদন করা থেকে বিরত রাখার জন্য কাউকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শনের জন্য) দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন; দ. বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধির ধারা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩-এর অধীন (অপরাধীকে শাস্তি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য উপহার ইত্যাদি গ্রহণ এবং সরকারি কর্মচারিকে তার কর্তব্য পালনে বাধাদান করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান, আক্রমণ ও অপরাধমূলক বল প্রয়োগের জন্য) দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন; ধ. জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন; এবং ন. কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষিত হন। শোনা যায় যে, আসন্ন *স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮*-এও প্রার্থীদের জন্য এমনই যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিধি-বিধান থাকবে।

উল্লেখ্য যে, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দু'টি বাড়তি অযোগ্যতার মাপকাঠি প্রযোজ্য। যেমন, কোন প্রার্থী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হলে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য হবেন (ধারা ৯(জ))। একইভাবে কোন ব্যক্তির ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহিত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকলে তিনিও প্রার্থী হতে পারবেন না (ধারা ৯(ট))।

অনেকে মনে করেন যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের যোগ্যতার মানদণ্ড আরো কঠোর হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে ছোট ও চতুর দুর্বৃত্তরা, যারা হয় কারাদণ্ড এড়াতে পেরেছেন কিংবা দুই বছরের কম মেয়াদের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অর্থাৎ ছোট দুর্বৃত্তদের এখন নির্বাচনে অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই। এমনকি বড় দুর্বৃত্তরাও কারাভোগের পাঁচ বছর পর নির্বাচন করতে পারেন। এছাড়াও আইনের ফাঁক-ফোকরে অনেক অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। ভোটারদেরকে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করার সুযোগ দিতে হলে যে কোন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত সকল দুর্বৃত্তদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তদুপরি স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা হিসেবে পরপর দু'বছর বার্ষিক সাধারণ সভা ও লভ্যাংশ যারা পরিশোধ না করেন তাদেরকেও নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার কথা বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। এছাড়াও দুর্বৃত্তরা যাতে কোনভাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে না পারে সে লক্ষ্যে 'না' ভোটেরও বিধান করা যেতে পারে।

আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কিংবা চতুরতার মাধ্যমে কোন অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় নির্বাচিত হলে তাদেরকে অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে। নির্বাচিত মেয়র/কাউন্সিলর যদি দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালক কর্তৃক দণ্ডিত হন এবং অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তিনি তার পদ থেকে অপসারণযোগ্য হবেন। অসদাচরণ বলতে ক্ষমতার অপব্যবহার, সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিধি-নিষেধ পরিপন্থি কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধাগ্রহণ, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করা বা হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদানকে বুঝানো হয়েছে। (পৌরসভা অধ্যাদেশে ধারা ২৮ অনুযায়ী, সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান না করাকেও অসদাচরণের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এতে অসদাচারণের সংজ্ঞায় 'ইচ্ছাকৃত অপশাসনে'র পর 'ইত্যাদি' শব্দ যোগ করা হয়েছে, যা এটিকে আরো বিস্তৃত করেছে।) নির্বাচনের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য ছিলেন বলে প্রমাণিত হলেও

তিনি অপসারণযোগ্য হবেন। (সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ অনুযায়ী, তিন মাসের মধ্যে তা প্রমাণিত হতে হবে।) উল্লেখ্য যে, পৌরসভা অধ্যাদেশ অনুযায়ী, পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকলে কিংবা নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করলে কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করেছেন বলে ছয় মাসের মধ্যে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মেয়র/কাউন্সিলর অপসারণযোগ্য হবেন। অপসারণের জন্য অবশ্য আইনে বর্ণিত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। (এটি সুস্পষ্ট যে, অধ্যাদেশদ্বয়ের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে।)

নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্যপ্রদান

সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদেরকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পথ সুগম করতে হলে তাদের সম্পর্কে ভোটারদেরকে তথ্য দিতে হবে, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সাম্প্রতিককালে আমাদের ও প্রতিবেশী ভারতের আদালতের কাছ থেকে এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট প্রদান ভোটারদের বক্তব্য বা বাক-স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত – অর্থাৎ ভোটাররা বক্তব্য দেন অথবা বাক-স্বাধীনতা প্রয়োগ করেন ভোটাধিকারের মাধ্যমে। আমাদের উচ্চ আদালতও রায় দিয়েছেন, প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার রয়েছে এবং এ জানার অধিকার তাদের ভোটাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮ ও পৌরসভা নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮ -এর ধারা ১২ অনুযায়ী সকল প্রার্থীকে নির্ধারিত ফরমে হলফনামা দাখিল করতে হবে, যাতে নিম্নের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (ক) প্রার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট সত্যায়িত কপি (পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়); (খ) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কি না; (গ) অতীতে তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা ছিল কি না এবং তার রায়; (ঘ) তার ব্যবসা/পেশার বিবরণী; (ঙ) তার সম্ভাব্য আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ; (চ) তার নিজের এবং অন্যান্য নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী; এবং (ছ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে তার একক বা যৌথভাবে বা তার ওপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহিত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ওই সব প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহিত ঋণের পরিমাণ। এছাড়াও প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে তার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং প্রার্থী আয়কর দাতা হলে তার সম্পদের বিবরণীসহ সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। হলফনামায় অসত্য তথ্য দিলে অবশ্য সংশ্লিষ্ট মেয়র/কউন্সিলর অপসারণযোগ্য হবেন।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮ এবং *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮* অনুযায়ী, প্রার্থীদের দাখিলকৃত হলফনামা, সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন নির্বাচন কমিশন তার ওয়েবসাইটে জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন। এ বিধানের জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ। কারণ এটি ছিল 'সুজনে'র বহুদিনের দাবি। তবে আমরা আশা করব যে, কমিশন অতি দ্রুত তথ্যগুলো, বিশেষত হলফনামায় ও ব্যয়ের উৎস বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলো ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন। একইসাথে তথ্যগুলোর সারাংশ তৈরি করে গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে তা বিতরণ করবেন। আমরা আরো আশা করবো যে, হলফনামা ও তথ্য বিবরণীগুলো কমিশন ও সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং/সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেবেন। শুধু চূড়ান্ত প্রার্থীদের পরিবর্তে মনোনয়নপত্র জমাদানকারী সকল প্রার্থীর তথ্য প্রকাশের আমরা অনুরোধ জানাই। আরো অনুরোধ জানাই বিরুদ্ধ হলফনামা (counter affidavit) দাখিলের বিধান করার।

আমরা মনে করি, প্রার্থীর দাখিল করা তথ্যাদির সত্যতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাই-বাছাই করা কাম্য। তা নির্বাচনের আগেই হওয়া উচিত। বিগত কয়েকটি জাতীয় সংসদ উপ-নির্বাচনে দেখা গেছে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের দাখিলকৃত তথ্যাদি তদন্তের কোন বিধান না থাকায় অনেক প্রার্থীই সঠিক তথ্য প্রদান করেন নি।

অপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য করা

আমাদের সংবিধানের ৬৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি ... তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে।" সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা অধ্যাদেশেও একই ধরনের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু কখন থেকে – দণ্ডপ্রাপ্তির প্রথম রায় ঘোষণার দিন থেকে, না আপিল প্রক্রিয়ার সমাপ্তির পর থেকে – তা সংবিধান কিংবা আইনে কোথাও স্পষ্ট করা নেই। তবে *জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭*-এর ১১(৫) ধারা অনুযায়ী, "এই বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে এবং উক্ত

দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইলে, উক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাতীয় সংসদসহ যে কোন স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য হইবেন।" অনেক আইনবিদের মতে, *জরুরি বিধিমালার* এই বিধান আমাদের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (প্রথম আলো, ১৫ জুন, ২০০৮)

যারা *জরুরি বিধিমালার* পরিবর্তে প্রচলিত আইন দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও কি একই ধরনের বিধান প্রযোজ্য হবে? এ ব্যাপারে আমাদের আদালতের রায়, আমাদের জানামতে, অস্পষ্ট। *সিরাজুল হক চৌধুরী বনাম নূর আহম্মদ চৌধুরী* মামলায় (19DLR 766) হাইকোর্ট আপিল প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য হবেন বলে রায় দেন। পরবর্তীতে *এইচএম এরশাদ বনাম আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী* মামলায় [53DLR (2001)] দুই বিচারপতি বিভক্ত রায় দেন। বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার ব্যাপারে আপিল প্রক্রিয়া নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক বিভিন্ন দেশের অনেক রায় বিশ্লেষণের পর নিম্ন আদালতে দণ্ড ঘোষণা থেকে অযোগ্যতার বিষয়টি গণ্য করার পক্ষে অভিমত দেন। উল্লেখ্য যে, বিচারপতি খায়রুল হকের রায় ভারতীয় উচ্চ আদালতের রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

দণ্ডপ্রাপ্তির প্রথম রায়ের সময় থেকে নির্বাচন অযোগ্য ঘোষণার পক্ষে অকাট্য যুক্তি রয়েছে। একজন ব্যক্তি নির্দোষ যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হন – এটি সভ্য সমাজের সর্বজনস্বীকৃত একটি মূল্যবোধ। কিন্তু একজন ব্যক্তি আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার দু'বার সুযোগ পান। একবার আদালতে চার্জ গঠনের সময়। আরেকবার বিচারকালীন সময়ে। তাই দণ্ডাদেশ ঘোষণার শুরু থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার বিধান অযৌক্তিক নয়। এছাড়াও ঋণ খেলাপের অভিযোগে অভিযুক্তদেরকে আপিলের নিস্পত্তির না হওয়ার আগেই নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা গেলে, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্তদেরকে আপিল প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না কেন?

নির্বাচন সুষ্ঠু ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে চিহ্নিত সন্ত্রাসী, গুরুতর অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তথা দুর্বৃত্তদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর এ জন্য সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হলেই তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার কথা ভাবা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে কমিশন ২০০৪ সালে তাদের ২২-দফা সংস্কার প্রস্তাবে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালত কর্তৃক চার্জশীটভুক্ত হলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণার সুপারিশ করে। আইনভঙ্গকারিরা যাতে আইনপ্রণেতা না হতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ সুপারিশ করা হয়েছে। তাদের যুক্তি হলো যে: "The Commission is of the view that keeping a person, who is accused of serious criminal charges and where the Court is *prima facie* satisfied about his involvement in the crime and consequently framed charges, out of electoral arena would be a reasonable restriction in greater public interests. There cannot be any grievance on this. However, as a precaution against motivated cases by the ruling party, it may be provided that only those cases which were filed prior to six months before an election alone would lead to disqualification as proposed. It is also suggested that persons found guilty by a Commission of Enquiry should ... stand disqualified from contesting elections." (www.eci.gov.in). জম্মু এবং কাশ্মীরের রিপ্রেজেনটেশন অফ পিপল এক্ট-এ এ ধরনের একটি বিধান রয়েছে। এছাড়াও গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে বিচারের আগেই কিংবা বিচারকালীন সময়ে কারাগারে অন্তরীণ করা গেলে, তাদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না কেন?

নির্বাচনী ব্যয় সংকোচন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনীতি আমাদের দেশে একটি লাভজনক 'ব্যবসায়ে' পরিণত হয়েছে। আর টাকার খেলা হয়ে পড়েছে নির্বাচনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে নির্বাচনে টাকার প্রভাব দূর করতে হবে। তাহলেই সৎ ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হবেন এবং নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। নির্বাচনে টাকার প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে নির্বাচনী বিধিমালায় মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

পদ	সিটি কর্পোরেশন			পৌরসভা		
	ভোটার সংখ্যা	ব্যক্তিগত ব্যয়	নির্বাচনী ব্যয়	ভোটার সংখ্যা	ব্যক্তিগত ব্যয়	নির্বাচনী ব্যয়
	২(ক)	২ (খ)	২(গ)	৩(ক)	৩ (খ)	৩(গ)
মেয়র	সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ পর্যন্ত	সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ৫০ হাজার পর্যন্ত	সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা	২ লক্ষ টাকা
	৫ লক্ষ ১ হতে ১০ লক্ষ	সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা	৭ লক্ষ টাকা	৫০ হাজার ১ হতে ৭০ হাজার	সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা	৩ লক্ষ টাকা
	১০ লক্ষ ১ হতে ২০ লক্ষ	সর্বোচ্চ ১ লক্ষ হতে ৫০ হাজার টাকা	১০ লক্ষ টাকা	৭০ হাজার ১ হতে ১ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা	৪ লক্ষ টাকা
	২০ লক্ষ ১ ও তদুর্ধ্ব	সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ হতে তদুর্ধ্ব	সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা	৫ লক্ষ টাকা
কাউন্সিলর	১৫ হাজার পর্যন্ত	সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা	১ লক্ষ টাকা	৫ হাজার পর্যন্ত	সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা	৫০ হাজার টাকা
	১৫ হাজার ১ হতে ৩০ হাজার	সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা	১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৫ হাজার ১ হতে ১০ হাজার	সর্বোচ্চ ৭ হাজার টাকা	১ লক্ষ টাকা
	৩০ হাজার ১ হতে ৫০ হাজার	সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা	২ লক্ষ টাকা	১০ হাজার ১ হতে ২০ হাজার	সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা	১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
	৫০ হাজার ১ হতে তদুর্ধ্ব	সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা	২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	২০ হাজার ১ হতে তদুর্ধ্ব	সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা	২ লক্ষ টাকা

নির্বাচন কমিশন সিটি কর্পোরেশন মেয়রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা ও পৌরসভার মেয়রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও পৌরসভার কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা নির্বাচনী ব্যয়ের বিধান করেছে। এ সকল ব্যয় বিধিমালায় নির্ধারিত খাতের বাইরে করা যাবে না। তবে, একজন সৎ প্রার্থীর পক্ষে এত বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করা সম্ভব কি না সে ব্যাপারে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। ফলে সৎ প্রার্থী অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হবেন। তাই নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

বিভিন্নভাবে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা যায়। যেমন, প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকায় সকল প্রার্থীদের নিয়ে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণ একাধিক প্রজেকশন মিটিংয়ের আয়োজন করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও গত তিনটি উপনির্বাচনে 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র পক্ষ থেকে প্রার্থীদের জনগণের মুখোমুখি করে আমরা অতীতে উল্লেখযোগ্য সুফল পেয়েছি। একইসাথে প্রার্থীদের পক্ষে মিটিং, মিছিল, শোডাউনের ওপর কড়াকড়িভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি। গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল ছাড়া সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন এবং কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি। বস্তুত আমাদের দলগুলো পরিণত হয়েছে স্বার্থান্বেষীদের সিন্ডিকেটে। আমাদের দলগুলো, বিশেষত বড় দলগুলো পরিচালিত হয় মূলত কোটারি বা গোষ্ঠীস্বার্থে এবং তারা লিপ্ত দলবাজি এবং ফায়দাবাজিতে। তাই তারা ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নির্বাচনে জিততে বদ্ধপরিকর। এছাড়াও তারা লিপ্ত মনোনয়ন বাণিজ্যের মতো গর্হিত কাজে।

এ অবস্থার থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। আরো দরকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন। তাহলেই রাজনৈতিক দলগুলো সদাচরণ করবে এবং সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন সম্ভব হবে।

আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো নির্দলীয়ভাবে হওয়ার কথা। এগুলোর জন্য কোন দলীয় ব্যানার বা দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা হয় না। স্থানীয় নির্বাচন নির্দলীয় হওয়ার পেছনে যুক্তি হলো এর মাধ্যমে স্থানীয় অনেক সম্মানিত ও যোগ্য ব্যক্তি, যারা দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত নন বা হতে চান না, তারা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও দলবাজির দুষ্ট ছোবল

জাতিকে আরও বিভক্ত করে ফেলার বিরুদ্ধে এটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে। তবুও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এ সকল নির্বাচনে দলীয়ভাবে মনোনয়ন দিয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক। এবারো তারা তা করছে। আশা করি, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও নৈতিকতার খাতিরে রাজনৈতিক দলগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সকল হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে।

আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ

আমাদের দেশে অনেক আইনকানুন রয়েছে, যা প্রয়োগ করা হয় না। নির্বাচন সংক্রান্ত আইনকানুনের ব্যাপারেও তা সত্য। যেমন, ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে সর্বমোট ১৯৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫৮৭ জন সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী (ফরম-১৭এ) এবং নির্বাচনী ব্যয়ের প্রকৃত বিবরণী (ফরম-১৭বি) দাখিল করেন। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ,* ১৯৭২-এ নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য প্রদান না করার জন্য ২ থেকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আইনের এ সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘনের জন্য কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিশন কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আর যেসব প্রার্থী হিসাব দাখিল করেছেন তারাও ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও তাদের প্রায় সকলেরই প্রকৃত ব্যয় নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে অতীতে দলমত নির্বিশেষে অধিকাংশ নির্বাচিত সংসদ সদস্যই মিথ্যাচার দিয়ে আইন প্রণেতা হিসেবে তাদের যাত্রা শুরু করেন।

নির্বাচনে টাকার খেলা রোধের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কঠোর ও পদ্ধতিগতভাবে নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশানের আমলে ১৯৯৩ সালে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন অন্ধ্র প্রদেশ, কর্নাটক ও সিকিমের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রার্থীদের দৈনন্দিন নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং-এর জন্য ৩৩৬ জন অডিটর নিয়োগ করেন, যার ফলে নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের নির্বাচন কমিশন আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন থেকে এ কাজটি শুরু করতে পারে। এছাড়াও প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী কোন অডিট ফার্ম কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা করার বিধান করা প্রয়োজন। কোন নির্বাচিত প্রতিনিধির নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে পদ থেকে অপসারণের বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। একইসাথে শক্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে অযোগ্যতার মাপকাঠি।

নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য আরও প্রয়োজন এলাকার মাস্তানদের দৌরাত্ম্য দূর করা। এক্ষেত্রেও ভারতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিহার প্রদেশের গত প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রাক্কালে কমিশনের নির্দেশে এক লক্ষ ৪০ হাজার জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়, যার ফলে ওই প্রদেশে প্রথমবারের মতো সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং লালু প্রসাদের মত প্রতাপশালী রাজনীতিবিদের দলকে পরাজিত হতে হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হলে, সুশাসন কায়েম করতে হলে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে সকল প্রশাসনিক স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি। আর এ জন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের এ সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা আর তাদের নির্বাচিত হয়ে আসার পথ সুগম করে দেয়া। এ লক্ষ্যে নির্বাচনে প্রার্থীদের অযোগ্যতার মাপকাঠিকে আরো কঠোর করা হয়েছে, তাদের তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, জরুরি বিধিমালার অধীনে শাস্তিপ্রাপ্তদের আপিল নিষ্পত্তির আগেই নির্বাচনে অযোগ্য করা হয়েছে এবং নির্বাচনী ব্যয়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এগুলোর থেকে সুফল পেতে হলে নির্বাচন কমিশনকে কঠোর ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আইনের বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে হবে এবং সরকারকে পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠে সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। তবে কোনভাবেই সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন সম্ভব নয় রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিকতা প্রদর্শন ও সদাচরণ ব্যতীত। এক্ষেত্রে সচেতন নাগরিকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা রাজনীতির গুণগত মান পরিবর্তন এবং সরকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোচ্চার হতে পারেন। একইসাথে তারা ভোটারদেরকে সজ্জনের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রণোদিত ও সংগঠিত করতে পারেন।